পাহাড় ডাকে আমায়

[ভ্রমণ কাহিনী]

দীনবন্ধু সেন

২০২৪ ডিসেম্বরের শেষ শনিবার, ভোর ৪:৩০। হটাৎ ঘুম ভাঙলো। কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই উঠে রাইডিং ব্যাগে টুকটাক জিনিস ঢুকিয়ে নিলাম। রাইডিং জ্যাকেটটা জাস্ট আলমিরা থেকে বের করবো, পাশের রুম থেকে মা এর গলা। ধীরে ধীরে উঠে আসলেন আমার রুমে। কোথায় যাবো জিজ্ঞেস করতে আমি সত্যিই কোনো গন্তব্যের কথা বলতে পারিনি। ভোর ৫:১৫ মিনিটে আমি রাইডিং গিয়ার পড়ে ঠাকুরের উদ্যেশ্যে প্রণাম করতেই মা এসে বাম হাতের কনিষ্ঠাতে কামড় দিয়ে আশীর্বাদ করে দিলেন। এই রীতি অবশ্য আমার প্রত্যেক ট্রিপে যাওয়ার আগেই হয়ে থাকে। ভোর ৫:৩০ মিনিটে কনকনে ঠান্ডায় আমি ধর্মনগর কালীমন্দিরে প্রণাম করে উঠে পড়লাম আমার টি আর জিরো ফাইভ ডি ফাইভ ফাইভ নাইন এইটে, এক গন্তব্যহীন ট্রিপের উদ্যেশ্যে। ৬:৩০/৭:০০ টায় আমি চেরাগী ধাবায় চা এর কাপে ঠোট মেলাতেই মনে হলো কাছাকাছি হাফলং থেকে ঘুরে আসা যায় এই উইক এন্ড, মান্থ এন্ড আর ইয়ার এন্ডে। এবার বাইকের ট্যাংক ফুল করে একটানে আমি শিলচর। ১০/১০:৩০ টায় হালকা টিফিন করে তারাপুর থেকে বাম দিকের রাস্তা ধরলাম।

তারাপুর থেকে দুধপাতিল হয় ডলু। গ্রামীণ রাস্তা। তবে ভালো সরু রাস্তা। দুধপতিল পেরিয়ে ডলু চা বাগানের ভিতরে প্রবেশ করতেই রাইডের ফিল আসছে অন্য রকম। ভরা ঠাণ্ডার দিনে দুপুরের গা গরম করা রোদে আমি বাগানের মাঝবরাবর ছুটছি একা। ছাত্রবেলার খুব কাছের বন্ধু রত্নজ্যোতি একবার আমায় বলেছিল ওর খুব শখ ছিল একটা চা বাগানের মাঝে অবস্থিত কোনো পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার হওয়া। শহরের কোলাহল থেকে দুরে, রাজনীতির খেলার বাইরে থাকার ইচ্ছা আমারও। ইয়ার ফোনে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে মনে মনে ভাবছি রত্নজ্যোতি পোস্টমাস্টার হতে পারেনি কিন্তু আমি হয়েছি। আমি পোস্টমাস্টার হয়েছি কিন্তু চা বাগানের ভিতরের কোনো পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার নই। যাইহোক, জীবনে সবকিছু নিজের চাওয়া, নিজের ইচ্ছে মতো হয় না। ভগবানের পরিকল্পনা থাকে অন্যরকম। জানি আসামের চা বিশ্বের অন্যতম চা এর মধ্যে একটি। আর আমি সেই চা বাগানের ভিতরের রাস্তা বরাবর চলছি আপন মনে।

ঘণ্টাখানেকের বাগান পাড়ির পর এবার শিলচর গুয়াহাটি মহাসড়কে। ওয়াও। কি রাস্তা। বাইকের গতি ৮০/৯০ কিমি প্রতি ঘন্টা না রাখলে হয়তো পিছন থেকে অন্য কেউ ধাক্কা দিতো। ডান থেকে বাম আর বাম থেকে ডানে বার বার টার্নিং কাটিয়ে কাটিয়ে চলছি হেলে দুলে। ক্লাস ইলিভেনে যদি নিহারেন্দু স্যার আমাদের না শিখাতেন যে বাইক চলন্ত অবস্থায় সর্বোচ্চ ৪৫° কোণে হেলোনো যায় নইলে দুর্ঘটনা ঘটবেই তাহলে আমি এই রাস্তায় চেষ্টা করতাম এই কোণের মান আরও বড় করার। টায়ারের খাঁজ, রাস্তার ব্যাংকিং আর ৪৫°কোণের ক্লাস আজ মনে হচ্ছে বারবার। আর পাড়ি দিয়ে চলছি দানব আকারের পাহাড়গুলিকে। আসামের একমাত্র হিলি স্টেশন হাফলং থেকে ট্রেন গুলি নামছে পাহাড়ের গা বেয়ে, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আর আমি উঠছি উপরের দিকে। কখনো ডান পাশে তো কখনো বাম পাশে পাহাড়ি নদীগুলিতে চলছে বিশালাকারের পাথরের খেলা। শত শত ঝর্ণার জলের অজস্র আঘাতগুলি মাথা পেতে নিচ্ছে পাথরগুলি। সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যাওয়া নদীতে কালো পাথরের উপর সাদা জলের বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ আর ঝর্ণার শব্দে যখন সবকিছু একাকার করে দিচ্ছে ঠিক তখনই কোনো দিক থেকে শুনতে পাবে ট্রেনের হর্ণের আওয়াজ। এককথায় সবকিছুর মিলনে সৃষ্টি হওয়া এই অনুভূতি শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট জায়গায় গিয়েই অনুভব করা সম্ভব।

আমি পাহাড়ের নীরবতা অনুভব করতে পারি। আমি পাহাড়ি নদীর যৌবন লক্ষ্য করতে পারি। আর আমি এই সবকিছুর স্বাদ পাওয়ার জন্যই পাহাড়ে যাই। পাহাড় ডাকে আমায়। কখনো সাড়া দেই কখনো জীবন্ত লাশ হয়ে পড়ে থাকি ঘরের কোণে, আটকে থাকি সম্পর্কের মায়াজালে, আর কর্মব্যস্ততার অজুহাতে। না কোনো কোনো ডাকে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। নেশাখোরদের নেশা ও আমার থেকে কম। মানুষ মারা যায় নেশার জন্য আর আমি বেঁচে আছি নেশা করেই। যে একবার এই নেশায় ডুবে গিয়েছে সে আর ফিরে আসতে পারে না এই নেশা থেকে। আমি ও সেই ভ্রমণ নেশায় ডুবে আছি। সময় পেলেই বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ার এই নেশা আমাকে বার বার ঘর থেকে টেনে বের করিয়েছে। নদী পাহাড় আর মহাসড়কের সৌন্দর্য্যকে মহিমান্বিত করেছে ব্রডগেজের উপর দিয়ে চলে আসা ট্রেনের ঝিকঝাক, ঝিকঝাক,ঝিকঝাক শব্দ। এবার পড়ন্ত বেলায় আমি হারাঙ্গাজাও বাজারে। ধীরে ধীরে খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করার তাগিদ ধাওয়া করছে আমায়। পরিকল্পনাহীন ট্রিপ, তাই হোটেল বুকিং নেই আগে থেকে। বিকেল ৪ টায় আমি ঝাটিঙ্গা, ঝাটিঙ্গা আবার বিখ্যাত পরিযায়ী পাখির আত্মঘাতী হওয়ার জন্য। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে পাখিরা এখানে এসে নিজেকে শেষ করে দিয়ে যায়। এবার আমিও ঝাটিঙ্গা বার্ড সুইসাইড পয়েন্টে। তবে নিজেকে শেষ করতে নয়। এসেছি একটি বছরকে শেষ করতে, নিজের একঘেয়েমি দুর করতে আর একাকীত্ব শেষ করতে।

এখান থেকে হাফলং শহর আর মাত্র ৭/৮ কিমি। পাহাড়ের উপর থেকে সূর্যাস্ত দর্শন কি অপরূপ লাগে যারা এখনো দেখেনি তারা অনুভব করতে পারবে না। সন্ধ্যা ৫ টায় আমি ডিমা হাসাও জেলার সদর দপ্তর হাফলং শহরে । ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ক্রিসমাসের ছুটি কাটাতে অনেকেই পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়ার সব হোটেল বুকড। এমন কোনো হোটেল বাকি রাখিনি যাদের দুয়ারে আমি যাইনি। নাহ্ পাইনি। কোনো হোটেলে রুম পাইনি। অবশেষে রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়েও যোগাযোগ করলাম। এখানেও থাকার সুবন্দোবস্ত নেই। সারাদিনের আনন্দ এবার মাটি হতে চলছে। অপরিকল্পিত ট্রিপের দুর্দশা গ্রাস করছে ধীরে ধীরে।

সব আশা শেষ হবার পর আমি এবার উপস্থিত হই হাফলং মূখ্য ডাকঘরে। ত্রিপুরায় আমিও একজন পোস্টমাস্টার। অফিসে ঢুকে নিজের পরিচয় দিলাম পোস্টমাস্টারকে। অত্যন্ত সহৃদয়বান ব্যক্তিত্বের অধিকারী পোস্টমাস্টার শ্রীযুক্ত দিলীপ বড়ুয়া। পরিচয় পর্ব শেষ হতেই আমাকে আশ্বাস দিলেন পোস্ট অফিসের মানুষ যখন হ্যাফলং এ রাত কাটাতে অসুবিধা হবে না। এবার আমার রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হলো পোস্ট মাস্টার এর ঘরেই। অফিস শেষ হলো। রুমে গেলাম। ফ্রেশ হলাম। শহর ঘুরতে বেরিয়ে পড়লাম। রাতের শহরে পর্যটকদের আকৃষ্ট করছে শহরের মাঝখানের সেই হাফলং লেক। লেকের চারিপাশের লাইটিং আর ঝুলন্ত ব্রিজ সঙ্গে আপনজনদের নিয়ে আড্ডা দেওয়ার যে ব্যবস্থা রয়েছে ইচ্ছে করলে কেউ সারা রাত কাটাতে পারে এই লেকের পাশেই। এছাড়াও শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে রামকৃষ্ণ মিশন, লক্ষী নারায়ণ মন্দির, জগন্নাথ বাড়ি আর চার্চ। শহরের মাঝখানেই স্বগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে দনবস্কো স্কুলসহ অসম্ভব সুন্দর সেই চার্চ। পর্যটকদের টেনে ভিড় ধরিয়ে রাখছে এই চার্চ।

রাতের খাওয়া দাওয়া করে একটু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়লাম। উদ্যেশ্য পরেরদিন ভোর বেলা সূর্যোদয় দেখবো। ভোর বেলা ঘুম ভাঙলো , ধীরে ধীরে পোস্টমাস্টার মহাশয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ভোর ৫:৩০ এর আগেই আমি ভিউ পয়েন্টে উপস্থিত। সৌভাগ্যবশত আরও কয়েকজন সেনাবাহিনীর জওয়ানকেও পেয়ে গেলাম এখানে। ওরাও ঘুরতে এসেছে। আই লাভ ডিমাহাসাও এর

সামনে দাড়িয়ে আমি যখন একটি ফটো উঠার জন্য ওদেরকে অনুরোধ করছি সূর্যমামা তখন পিছন থেকে পাহাড় টপকিয়ে উকি মারছেন। সত্যিই এই পয়েন্ট থেকে সূর্যাস্ত, সূর্যোদয় দর্শন করা দুর্দান্ত। আজকের দিনে দাড়িয়ে এর কিছু স্থিরচিত্র না রাখলে এই ট্রিপটাই বৃথা। বন্দী করলাম এমন কিছু মুহূর্ত। ঘন্টাখানেক এখানে খাটানোর পর এবার শুরু হলো নতুন কোনো জায়গার উদ্যেশ্যে রওয়ানা। এবার মহাসড়ক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে উপস্থিত হলাম মাইবং। ওয়াও। পাথর আর পাথর। পাথরের সাম্রাজ্য। কাছারি রাজত্বের ধ্বংসাবশেষ আর পাথরের রাজত্ব। প্রকৃতি নিজ হাতে সাজিয়েছেন মাইবং, মাহুর এই জায়গাগুলিকে। একা একা ঘুরছি আর ভাবছি এগুলোকে নিয়ে মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাস নেই কেনো? কি নেই এর মধ্যে। হাফলং স্টেশনকে পূর্ব ভারতের সুইজারল্যান্ড বলা হয়। কিন্তু মাহুর, মাইবং এগুলোকে মানুষ সামনেই আনছে না। ধীরে ধীরে চলছি অজানা অচেনা রাস্তায়। দিদাওকা, লামডিং হয়ে আমি এবার লঙ্কাতে। তবে শ্রীলঙ্কা নয়। আসামের লঙ্কা, এক ঝালহীন লঙ্কা। যেখানে রাবন নেই কিন্তু রামের ভক্ত প্রচুর। লঙ্কা থেকে ১৫ কিমি দূরে পানিমুর জলপ্রপাত। কপিলি নদী এই অঞ্চলে জলপ্রপাতে পরিণত হয়েছে। পানিমুর জলপ্রপাত নর্থ ইস্ট এর নায়াগ্রা ফলস। এখানে গিয়ে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছি এই নদীতে এগুলো জল দেখছি না কেরোসিন। জল আর কেরোসিনের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন এই জলপ্রপাতে গেলে। বছরের শেষ রবিবার, প্রায় তিন/চার হাজার মানুষের ভিড়, পিকনিক পার্টি মুটামুটি দুশো এর উপর। অগণিত মানুষের আনন্দে আমি একা। একা একা ঘুরছি ফিরছি সুযোগ পেলে কাউকে একটা ফটো তোলার জন্য আবদার করছি। এইভাবে এক পিকনিক পার্টির কয়েকজনের সাথে পরিচয় হয় গেলো। দুপুরের খাওয়া দাওয়া তাদের সাথেই সারলাম । এবার বেরোবার পালা। গুগল ম্যাপ মেরে দেখলাম উমরাংশু হয়ে হাফলং পৌঁছানোর শর্ট রাস্তা আছে। পানিমুর থেকে ৩০ কিমি দূরে উমরাংশু। উমরাংশুর গলফ ফিল্ড আর কপিলী নদীর উপর বাঁধ দিয়ে যে কৃত্রিম লেক তৈরি করা হয়েছে তা ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে টানবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উমরাংশুতেই সন্ধ্যা হয় হয় ভাব। আমি গুগল ম্যাপ অন করে রাতের অন্ধকারে ভাঙ্গা রাস্তায় বাইকের ক্লাস টানছি, এক্সেলেটর বাড়াচ্ছি আর ব্রেক কষছি। নির্জন পথ, একা আমি। মেঘালয়ের গা ঘেঁষে সরু পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে পৌঁছে গেছি আবার হাফলং শহরে। রাত তখন ৯:০০ টা। হাফলং এর বিখ্যাত মোমো খেলাম মন ভরে। নতুন নতুন ফাস্ট ফুডের আইটেম টেস্ট করলাম অনেক কিছু। কিন্তু আজ আর পোস্টমাস্টারকে ডিস্টার্ব করা যাবে না। থাকার ব্যবস্থা নেই। রাত ৯:৩০ তে রওয়ানা দিলাম বাড়ীর উদ্দেশ্যে। রাতের অন্ধকারে কখন কোন জায়গা ক্রস করলাম বুঝতেই পারলাম না। ঘন কুয়াশায় বাইক চালাতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। শিলচরের আসে পাশে কোথাও এসে গেছি বুঝতে পারলাম। রাতের কর্তব্যরত পুলিশ কেউ কেউ ঠাণ্ডার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে আগুনে হাত শেকে দিচ্ছেন। আমি ও যোগ দেই তাদের সাথে। কিছুক্ষন কথাবার্তা আলাপচারিতার পর ঘুমন্ত শিলচর শহরের উপর দিয়ে চলে এলাম বদরপুর। রাত ২ টায় স্টেশনের পাশের স্টল থেকে চা খেয়ে নিজেকে গরম করলাম। ঘুমকে দুর করলাম, তৈরি করলাম নিজেকে বাকি পথের জন্য। দুইদিনের লাগাতার চাপে বাইকের চেন কিছুটা ঢিলে হয়েছে বুঝতে পেরেও এক টানে যখন ধর্মনগর পৌঁছাই তখন ঘড়িতে ঠিক ৪:০০ টা। এভাবেই শেষ হলো ২০২৪, শেষ হলো এক পাহাড়ের ডাকে সাড়া দেওয়া, শেষ হলো এক রোমাঞ্চকর ট্রিপ। সোমবার অফিসে ফিরলেও বার বার মনে হলো পাহাড় ডাকে আমায়।।